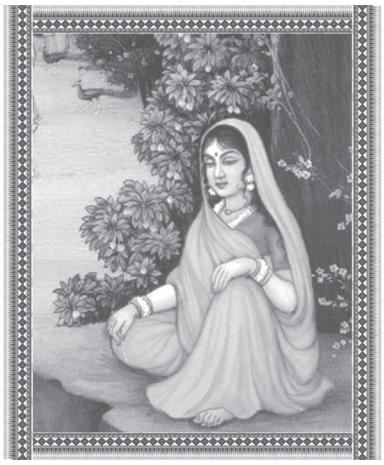

‘জনমদুঃখিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা’

স্বামী বলভদ্রানন্দ

‘‘সীতা আমাদের জাতির জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আছেন। প্রতিটি হিন্দু নরনারীর রক্তে তিনি রয়েছেন। আমরা সবাই সীতার সন্তান।’’ স্বামীজী বলেছেন এই কথা। আবাল্য স্বামীজী রামায়ণের চরিত্রাবলি, বিশেষত সীতার অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি বলছেন, ‘‘সীতার কথা আর কী বলব? তোমরা পৃথিবীর সমস্ত অতীত সাহিত্য দেখতে পার, ভবিষ্যতে যে-সাহিত্য হবে তাও খুঁজে দেখতে পার—সীতার মতো আর একটি চরিত্র খুঁজে পাবে না। সীতা অনন্যা; ওই চরিত্র একবারই মাত্র রচিত হয়েছে। রাম হয়তো কয়েকটি হতে পারেন, কিন্তু সীতা আর হবেন না। তিনি প্রকৃত ভারতীয় নারীর সম্পূর্ণ প্রতিরূপ, কারণ নিখুঁত নারীচরিত্রের সমস্ত ভারতীয় আদর্শ সীতার ওই অনন্য জীবন থেকে গড়ে উঠেছে।... চিরকাল তিনি থাকবেন। সেই গৌরবময় সীতা, যিনি পবিত্রতার চেয়েও পবিত্রতরা, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ও সর্বংসহা।... আমাদের সমস্ত বেদ, পুরাণ চিরকালের জন্য অদৃশ্য হতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পাঁচজন অশিক্ষিত হিন্দুও থাকবে, সীতার কাহিনি থাকবে।’’

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস্যভক্তি সাধনের সময় পঞ্চবটীতে কোনও ধ্যানচিন্তাদি ছাড়াই সাদা চোখে সীতা দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ‘‘জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখেছিলাম বলেই বোধহয়—তাঁর মতো আজন্ম দুঃখভোগ করছি।’’ বলা বাহুল্য, অবতারের দুঃখ আপামর মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের সমানুভবে।

‘জনমদুঃখিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা’—শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুটি শব্দে সীতা-জীবনের স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। আদিকাণ্ড ছাড়া রামায়ণের আর ছটি কাণ্ড জুড়েই স্পষ্ট ও অনুস্যূতরূপে উপস্থিত জানকীর দুঃখ-কাহিনি। এবং সে-কাহিনির সূচনা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বন্ধের ঘটনার সঙ্গে। গোটা অযোধ্যা উৎফুল্ল—দশরথের যোগ্যতম জ্যেষ্ঠ পুত্র, দশরথের নয়নের মণি রামচন্দ্র কাল রাজপদে অভিষিক্ত হবেন—যে-রামচন্দ্র একই সঙ্গে মাতৃত্রয় ও ভ্রাতৃত্রয়েরও নয়ণের মণি। তাই সবাই খুশি। দশরথ খুশি, কৌশল্যা-সুমিত্রা-কৈকেয়ীও খুশি, খুশি অতি অবশ্যই সীতাও। এমন সময় কৈকেয়ীর

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

মনকে বিষিয়ে তুললেন মন্থরা। সহজে সফল হননি তিনি। মন্থরার মন্ত্রণার উত্তরে কৈকেয়ী বলেছিলেন, ''রাম ধর্মজ্ঞ, গুণবান, শান্ত, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী। তিনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, সেজন্য যৌবরাজ্যের অধিকারী। রাম কৌশল্যার চেয়েও আমার অধিক সেবা করেন। রাজ্য যদি রামের হয় তবে তা ভরতেরও হবে।'' চতুরা মন্থরা হাল ছাড়েন না। তাঁর যে-যুক্তিটি কৈকেয়ীর মনকে টলিয়ে দেয় তা হল এই : ''তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। রাজার সব পুত্রই রাজ্য পায় না, সকলেই রাজ্যে থাকলে মহা অনর্থ হয়। রাম রাজ্য পেয়ে নিশ্চয়ই ভরতকে দেশান্তরে কিংবা লোকান্তরে পাঠাবেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ৮।২৭)। তাছাড়া তুমি তো এতদিন দর্পবলে কৌশল্যার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করনি, সে কি আর তার শোধ তুলবে না!''—''দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া। রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ॥'' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৮।৩৭)।

পুত্রের অকল্যাণ, এবং নিজে যেহেতু সত্যিই এযাবৎ কৌশল্যার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি, কৌশল্যার হাতে তার প্রতিফল পাওয়ার আশঙ্কা—দুটিই কৈকেয়ীর কাছে এখন বাস্তব বলে মনে হয়। মন্থরার যুক্তি তাঁকে অভিভূত করে ফেলে এবং তিনি অনড় হয়ে দশরথের কাছে তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুত দুটি বর হিসেবে ভরতের রাজ্যলাভ এবং রামের চোদ্দো বছরের বনবাস চান। পরদিন সকালে রাজ্যাভিষেকের সময় দশরথ রামকে ডেকে পাঠান। গোটা অযোধ্যা আসন্ন অভিষেকের প্রস্তুতিতে আনন্দমুখর। রামচন্দ্রের পরিধানেও অভিষেকের উপযুক্ত বসন ও ভূষণ। পিতার কাছে যখন তিনি পৌঁছলেন, শোক ও মর্মবেদনায় মুহ্যমান দশরথ মুখ ফুটে রামকে ওই মর্মান্তিক কথা বলতে পারলেন না। কিন্তু কৈকেয়ী সেখানে ছিলেন, তিনি তখন হৃদয়হীন। বিনা দ্বিধায় বিনা লজ্জায় তিনি রামচন্দ্রকে দুঃসংবাদটি দিলেন। রাম শান্তভাবে সব শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে যেতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন মাতা ও সীতাকে ঘটনার এই মর্মান্তিক পরিবর্তনের কথা জানানো। কারণ, তাঁরা দুজনেই তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ—একজন গর্ভধারিণী জননী, অন্যজন সহধর্মিণী; সকলের চেয়ে তাঁরাই সব থেকে উৎফুল্ল হয়ে অপেক্ষা করছেন তাঁর রাজ্যাভিষেকের জন্য।

রামচন্দ্র কৌশল্যাকে যখন বনবাসের খবরটি দিলেন, তিনি তখন শালগাছের কর্তিত কাণ্ডের মতো মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ২০।৩২)। কিছু পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে রামচন্দ্র অনেক যত্নে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সীতা দেবীর কাছে এলেন এই সংবাদ দিতে।

সীতা কিন্তু দুঃসংবাদটি শুনে কৌশল্যা মায়ের মতো মূর্ছিতা হলেন না। কারণ, তিনি জানতেন যেখানে রাম থাকবেন তিনিও সেখানেই থাকবেন এবং সেটিই তাঁর কাছে রাজপ্রাসাদ সম। কিন্তু রাম যখন তাঁকে নানা উপদেশ দিয়ে বললেন, ''তোমাকে অযোধ্যাতেই থাকতে হবে; যাতে কারও প্রতি অপরাধ না হয় তেমন কাজই তোমায় করতে হবে—এটাই তোমার প্রতি আমার বক্তব্য'', তখন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে রামচন্দ্রকে কয়েকটি কথা বললেন : ''আপনি গুরুতর কথাকে লঘুভাবে কেমন করে বলছেন? আপনার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। আপনি যা বললেন তা অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ বীর রাজপুত্রের বলার অযোগ্য ও অখ্যাতিকর, তাই শ্রবণের অযোগ্য। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ—সবাই নিজের নিজের ভাগ্য লাভ করে ও সেই অনুসারে চলে। একমাত্র নারীই স্বামীর ভাগ্য লাভ করে। অতএব আপনার সঙ্গে আমিও বনে বাস করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। যদি আপনি আজই দুর্গম বনে প্রস্থান করেন তবে আমিও পথের কুশ ও কাঁটা দলিত করে আপনার আগে আগে চলব।

আমার পাতিব্রত্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে, ভোজন শেষে পানীয় জলের মতো আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন; আমার মধ্যে কোনও পাপ নেই। অট্টালিকায় অবস্থিতি অথবা আকাশযানে আকাশভ্রমণের চেয়ে পতির পদচ্ছায়ায় অবস্থান করা সতী নারীর কাছে অধিক মহত্ত্বের বিষয়। নানান অবস্থায় কীভাবে থাকতে হবে, সেই বিষয়ে আমার মা-বাবা যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছেন; অতএব আপনার অবর্তমানে আমায় কীভাবে থাকতে হবে সে-বিষয়ে আর বলতে হবে না। আজ আমি আপনার সঙ্গে বনে যাবই, কোনও সন্দেহ নেই। বনগমনে উদ্যতা আমাকে কেউই নিবৃত্ত করতে সমর্থ হবে না।” (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭।২-৫, ৭-১০, ১৫)

রামের সঙ্গে বনবাসগমনে যে-সীতা দৃঢ় ও অটল, পনেরো বছর পর সেই সীতাই রাম-বিহীন বনবাসের সংবাদ পাওয়া মাত্র মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন। রাবণবধের পরে রামসীতা তখন অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ এবং সমগ্র অযোধ্যাপুরীতেই প্রতিটি মানুষ আনন্দে আছেন, কারণ এই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত রামরাজ্য। রামচন্দ্র ও সীতার সেদিন অধিকতর আনন্দ—কারণ সেদিনই রাম জেনেছেন, সীতা মা হতে চলেছেন। খুশি হয়ে রাম বললেন, সীতা দেবীর যে-কোনও বহু আকাঙ্ক্ষিত সাধ তিনি পূরণ করতে চান। সীতা বললেন, তিনি তপোবনে মুনি ও মুনিপত্নীদের মধ্যে একটি রাত হলেও থাকতে চান। সেদিনই রাম শুনলেন, প্রজারা রাবণরাজ্যে সীতার অবস্থান নিয়ে নানান মন্দকথা বলছে। সীতা অপাপবিদ্ধা জানা সত্ত্বেও রাম সীতাবর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। রামের আদেশে পরদিনই সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণ যাত্রা করলেন। বললেন, তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য রাম তাঁকে তপোবন দেখতে পাঠাচ্ছেন। পরদিন গঙ্গার পরপারে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে পৌঁছে লক্ষ্মণ যখন কাঁদতে কাঁদতে সীতাকে জানালেন, একদিন-দুদিনের জন্য নয়—রামচন্দ্র তাঁকে লোকাপবাদের ভয়ে চিরকালের জন্য বনবাসে পাঠিয়েছেন, সীতা তখন সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিতা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হলে সীতা অশ্রুবিসর্জন করে বলতে লাগলেন : ‘‘সৌমিত্রি, বিধাতা আমাকে দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। না-জানি কী পাপ করেছিলাম, অথবা কারও পত্নীবিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম। তাই বুঝি রাজা আমাকে পতিব্রতা জেনেও পরিত্যাগ করলেন। লক্ষ্মণ, এর আগে আমি স্বামীর পদচ্ছায়ায় থাকব বলে স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করেছিলাম। এখন আমি তাঁর বিরহে কীভাবে নির্জনে বাস করব? আমার গর্ভে এখন রাজার সন্তান। আমি তো এখন তাঁর বংশলোপের ভয়ে আত্মহত্যাও করতে পারব না” ইত্যাদি। সীতার এই বিলাপ আমাদের অন্তরকে মথিত করে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সীতার দর্শন পেয়েছিলেন, ঠাকুর তাঁর মুখে ‘প্রেম-দুঃখ-করুণা’ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে এক ‘অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব’ও দেখেছিলেন, যা ‘দেবীমূর্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না।’ যিশুখ্রিস্টের দর্শন প্রসঙ্গে আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপরোক্ষ দর্শনগুলি কতদূর সত্য। সীতা দেবীর এই ওজস্বিনী রূপের একটি দৃষ্টান্ত আমরা আগে দেখেছি এবং তাঁর সেই ওজস্বিনী রূপের প্রকাশ আমরা আরও দুবার রামায়ণে দেখেছি। একটি : রাবণবধের পর যখন সীতার চরিত্রে সন্দেহ করে রাম বলেছিলেন, ‘‘এ-যুদ্ধের আয়োজন তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কাজ করেছি। এখন তুমি লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা বিভীষণ যাকে ইচ্ছা করো তার কাছে যাও। অথবা তোমার যা ইচ্ছা করো।” তখন সীতা একাধারে গভীর দুঃখ ও তেজের সঙ্গে ন্যায্যতই বলেছিলেন, ‘‘নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে তুমি

আমাকে তেমন করে বলছ কেন? যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে তখন আমাকে বর্জনের কথা জানাওনি কেন? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তোমাদের অনর্থক কষ্ট পেতে হত না। পরাধীন বিবশ অবস্থায় রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছে, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু যে-হৃদয় আমার অধীন, তা তোমারই ছিল। দীর্ঘকাল আমরা পরস্পরের সঙ্গে থেকেছি, আমাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে—এরপরেও যদি তুমি আমাকে না বুঝে থাক, তবে আমার পক্ষে তা চিরমৃত্যু। জনকের নামে আমার পরিচয়, বসুধাতল থেকে আমার উৎপত্তি—এসব তুমি গ্রাহ্য করলে না; তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান করলে না।"

সীতার প্রতিটি কথা এখানে সংযত, যুক্তিপূর্ণ ও দৃঢ়। সত্য বলেই তা দৃঢ়। আরও লক্ষণীয় তাঁর মার্জিত শব্দচয়ন। অপ্রত্যাশিত আঘাতের মুহূর্তেও, সেই আঘাত যিনি দিচ্ছেন সেই রামচন্দ্রকে তিনি সরাসরি নীচ বলেননি। কারণ তিনি জানতেন, রামচন্দ্র যেমন নীচ ব্যক্তি নন, তেমন তিনি নিজেও নীচ স্ত্রীলোক নন। রামচন্দ্রের অনুচিত কথার তিনি সংগত প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু তার উত্তরে কোনও অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করলেন না।

এর পরের ঘটনা আমরা জানি। সীতার নির্দেশে লক্ষ্মণ অগ্নি প্রস্তুত করলেন। রামকে প্রদক্ষিণ ও করজোড়ে প্রণাম করে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। অগ্নি তাঁকে কোলে করে বেরিয়ে এলেন। অন্য দেবদেবীদেরও আবির্ভাব হল। তাঁরা প্রত্যেকে রামকে বললেন, সীতা অপাপবিদ্ধা। তখন রাম তাঁকে গ্রহণ করলেন।

সীতা এরপর তাঁর দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন রামায়ণের শেষ অংশে। রামের দ্বারা বনবাসে প্রেরিত হওয়ার পর বারো বছর কেটে গেছে। যমজপুত্র লব ও কুশ তাঁর ও বাল্মীকির শিক্ষায় একাধারে ক্ষত্রিয় ও তাপসসুলভ শ্রেষ্ঠ গুণাবলিতে সিদ্ধ হয়েছেন। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের আখ্যান লব ও কুশ মধুর সংগীতের মাধ্যমে সুললিতভাবে পরিবেশন করেন। একদিন বাল্মীকির সঙ্গে অযোধ্যার রাজসভায় গিয়ে তাঁরা রামায়ণ-গান করলেন। রাম বুঝলেন, এঁরাই তাঁর ও সীতার পুত্র। তিনি সীতাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন। বললেন, পরদিন রাজসভাতে এসে সীতা যেন শপথ করে বলেন তিনি শুদ্ধ, তবেই তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন। পরদিন বাল্মীকি সীতাকে নিয়ে রামের সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, ''রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, তুমিই এখন আজ্ঞা করো, কীভাবে সীতা তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। এই দুই যমজ পুত্র তোমারই। আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলেছি স্মরণ হয় না।" রাম বললেন, ''আপনি যা বললেন সব আমি বিশ্বাস করি। এই লব-কুশ আমার পুত্র তা জানি। তথাপি এই জনতার সামনে সীতার বিশুদ্ধি প্রমাণ হলে আমি খুশি হব।"

তখন গৈরিকবস্ত্রধারিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ''আমি যদি কায়মনোবাক্যে শুধু রামেরই অর্চনা করে থাকি তবে ভগবতী বসুন্ধরা, তুমি আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দাও।" ভূগর্ভ থেকে এক দিব্যসিংহাসন সহ ধরিত্রী দেবী উত্থিত হলেন, তিনি মা জানকীকে আলিঙ্গন করে সেই সিংহাসনে বসালেন এবং তাঁকে নিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন।

সীতার অন্তর্ধানের প্রকরণটি শোকাবহ হলেও এতে তাঁর যে-তেজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়। লোকনিন্দার ভয়ে ও তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজারঞ্জক রাজার কর্তব্যের খাতিরে রাম আপন হৃৎপিণ্ড উৎপাটনের মতো অতি দুঃখে পত্নীকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনিও স্বামীর কলঙ্ক-মোচনের জন্য সেই দণ্ড নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন।

বারো বছর পর আবার যখন রাম তাঁকে সকলের সামনে শপথ করে নিজের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে বললেন তখনও তিনি তা করলেন। কারণ তিনি বুঝেছেন, এবারও রাম এটি করছেন প্রজানুরঞ্জনের প্রয়োজনে—হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করে। কিন্তু একান্ত পতিপ্রাণা হয়েও এখন আর তাঁর পতির সঙ্গে পুনর্মিলনের বাসনা নেই। তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে। রামের কলঙ্কমোচন হয়েছে। তাঁর পুত্র দুটিকে তিনি বারো বছর পালন করেছেন। জীবনের আগামী পথে এগোনোর উপযুক্ত করে দিয়েছেন। তাই নিজের ‘পবিত্রতাস্বরূপিণী’ স্বরূপকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ এখানে মর্যাদাপুরুষোত্তমের মহিমাকেও ছাপিয়ে গেছে।

আর একটি কথা। রামের বনবাসের প্রস্তাবে যখন কৈকেয়ী ও মন্থরা ছাড়া প্রত্যেকেই বিচলিত, ক্ষুব্ধ কিংবা ক্রুদ্ধ, এবং সীতাও রামের সঙ্গে যাবেন নির্দিষ্ট, তখন রাজগুরু বশিষ্ঠ বলেছিলেন, ‘‘ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জিতে।/ অনুষ্ঠাস্যতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্॥’’ (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৭।২৩)—দেবী সীতাকে বনে যেতে হবে না। তিনি রামের জন্য নির্দিষ্ট আসনে অর্থাৎ রাজসিংহাসনে বসবেন। বশিষ্ঠের এই প্রস্তাবটির দিকে কেউ দৃক্‌পাত করেছেন বলে রামায়ণে দেখা যায় না। হয়তো তার কারণ, সীতা নিজেই বনবাসে অভিলাষী হয়েছেন, কারও অনুরোধেই তিনি অযোধ্যায় থেকে রাজ্যশাসন করতেন না। তাছাড়া যে-দুটি পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে যাচ্ছেন, তার একটি তাহলে পালিত হত না। সর্বোপরি, যুগের প্রয়োজন অর্থাৎ অধর্ম-মূর্তি রাবণের সংহার তাতে বাকি থেকে যেত।

কিন্তু বশিষ্ঠ পুরাণ ও ইতিহাস-প্রথিত মহাশক্তিধর পুরুষ। তিনি মিত্রাবরুণের পুত্র। দশ প্রজাপতির অন্যতম। বিভিন্ন পুরাণমতে, তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম; ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্রের একজন। তাঁর ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্র নাস্তানাবুদ। এমন মানুষের মুখনিঃসৃত কথা কখনও নিষ্ফল হয় না। তাই যে-কথা শুধুমাত্র একটি কথা হয়েই রামায়ণে থেকে গেছে, সেটি সার্থক হয়েছিল ত্রেতাযুগে নয়, দ্বাপরযুগেও নয়—এই কলিযুগে, যখন রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ হয়ে এসে লীলাসঙ্গিনীকে বললেন, ‘‘শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।’’ ‘‘এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি করতে হবে।’’ তাই দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে শ্রীশ্রীমা একাধারে রামকৃষ্ণ-সারদা হয়ে বিরাজ করেছেন সকলের গণ্ডিভাঙা মা, জন্মজন্মান্তরের মা হয়ে।

শ্রীশ্রীমা নিজেই কখনও বলেছেন, ‘‘আমি সীতা।’’ শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে সীতা দেবীর হাতে যেরকম বালা দেখেছিলেন, সেইরকম ডায়মনকাটা বালা মায়ের জন্য গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুর রেলস্টেশনে এক পশ্চিমদেশীয় কুলি মাকে ‘জানকী মা’ বলে চিনেছিল। মা তার সেই দর্শনকে মান্যতা দিয়ে সেই রেলস্টেশনেই তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

বছর পঁচিশ আগের কথা। আমি ‘কলকাতা বুক ফেয়ার’-এ ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর স্টলে আছি। তখন মেলা বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে গেছে বলে ভিড় কমে এসেছে। হঠাৎ-ই চার-পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা ছেলে আমাদের স্টলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ছুটে ভেতরে চলে এল। সে এল বলে তার মাও ঢুকলেন। মাঝখানের টেবিলে ‘শতরূপে সারদা’র কয়েকটি কপি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। ছেলেটি সোজা সেখানে গিয়ে ‘শতরূপে সারদা’র প্রচ্ছদটির দিকে দেখিয়ে হইচই করে মাকে বলতে থাকে : ‘‘দেখো মা, সীতা! দেখো মা, সীতা!’’ আমি অবাক! ✠